প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩

আলো পহর

এমএলই নিউজলেটার

মাতৃভাষায় লেখাপড়া মানুষের অধিকার

মাতৃভাষায় কথা বলা, লেখাপড়া করা মানুষের অধিকার। এ অধিকার অর্জন ও সমুন্নত রাখতে বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি কাজ করছে অনেক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। সংস্থাগুলো ইতোমধ্যে বিভিন্ন ভাষাভাষী শিশুদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর অঙ্গীকার অনুসারে সকল জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় লেখাপড়া শুরু করার সমুদয় প্রক্রিয়াকে বেগবান করার জন্যে সংশ্লিষ্ট মহলে সচেতনতা বিকাশের লক্ষ্যে এমএলই নিউজলেটার **পহর** প্রকাশিত হচ্ছে।

এই নিউজলেটারের প্রকাশনা মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার দাবি আদায়ের পক্ষে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

পহর প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

রাশেদা কে. চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান

মাতৃভাষাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রয়োজন

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসরত বিভিন্ন জাতিসত্তার শিশুদের জন্য মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা বিষয়ক নিউজলেটার **পহর** প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর অঙ্গীকার অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের সকল শিশু বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলে বসবাসরত বিভিন্ন ভাষাভাষী শিশুদের শিক্ষার চাহিদা পূরণে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই পত্রিকাটি যথাযথ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। একই সঙ্গে মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণেও পত্রিকাটি অবদান রাখবে বলে আমার ধারণা।

এই পত্রিকা প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য গণসাক্ষরতা অভিযানকে, বিশেষ করে এটি প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

আমি পত্রিকাটির সাফল্য কামনা করি।

ফজলে হোসেন বাদশা, এমপি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার

পরিপ্রেক্ষিত ও প্রয়োজনীয়তা

মাতৃভাষা শিশুর প্রথম ভাষা। এ ভাষার মাধ্যমেই শিশু তার পরিবেশকে চিনতে শেখে, যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে এবং পরিবেশ প্রতিবেশের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কগুলো বুঝতে পারে। শিশু শিক্ষার শক্তিশালী ভিত রচনার জন্য মাতৃভাষাই প্রথম কার্যকর ভাষা। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণায় দেখা গেছে, পরবর্তী শিক্ষার একটি শক্তিশালী বুনিয়াদ তৈরি করার জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অন্তত ৫ বছর মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। তাঁরা সবাই বলেছেন, সকল ভাষাভাষী ও সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর জন্য মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা দরকার।

অঙ্গীকার নীতিমালা ও কর্মকৌশল

মাতৃভাষা শিক্ষা গ্রহণ ও মাতৃভাষা চর্চা প্রত্যেক মানুষের মৌলিক ও জন্মগত অধিকার। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়সহ বিশ্বের প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশ মাতৃভাষায় শিশু শিক্ষার স্বীকৃতি দিয়েছে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (১৯৮৯) অনুচ্ছেদ-২৮ (১)-এ সমান সুযোগের ভিত্তিতে শিশুর শিক্ষা লাভের অধিকার, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও সহজলভ্য এবং স্কুলে শিশুর উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং ঝরে পড়ার হার কমানোর কথা বলা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ২৯ (১)- এ শিশুর পিতামাতার নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং শিশু যে দেশে বসবাস করবে সে দেশের মূল্যবোধ, শিশুর নিজস্ব মাতৃভূমিসহ অপরাপর সভ্যতার প্রতি সম্মানবোধকে জাগিয়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। ৩০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- 'যে দেশে জাতিগত, গোষ্ঠীগত, ধর্মীয় কিংবা ভাষাগত সংখ্যালঘু কিংবা আদিবাসী সম্প্রদায়ের জনগণ রয়েছে, সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে নিজ সংস্কৃতি বজায় রেখে, ধর্মের কথা প্রকাশ এবং চর্চা করা অথবা নিজ ভাষা ব্যবহার থেকে ঐ ধরনের আদিবাসী সংখ্যালঘুদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। তিনটি অনুচ্ছেদেই আদিবাসী শিশুর জন্য নিজস্ব ভাষায় লেখাপড়ার ও নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি অধ্যয়নের সুযোগ দানের কথা স্বীকার করা হয়েছে।

আইএলও সনদ নং ১০৭ ধারা-২৩: আদিবাসীদের অধিকার সংক্রান্ত খসড়া জাতিসংঘ ঘোষণা ২০০৬ (ধারা ৭ (২), ডাকার কর্ম-পরিকল্পনার ৭-এর (খ) অনুচ্ছেদের মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য (২০০০) দলিলেও আদিবাসীসহ সকল সুবিধাবঞ্চিত শিশুর শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বৈষম্য না করার কথা বলা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অধিকার, শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি এবং বৈষম্য হ্রাসসহ সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘোষণা, নীতিমালা ও দলিলে অনুস্বাক্ষর করার পাশাপাশি ইতোমধ্যে বেশকিছু আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ ধারায় ধর্ম, বর্ণ, জন্মস্থান ভেদে কোনো ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৫ ও ১৭ ধারায় অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক সর্বজনীন শিক্ষা বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মার্চ ২০০৮ মাসে প্রকাশিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা কাঠামোর উদ্দেশ্য অংশে বলা হয়েছে, শিশুদের লিঙ্গ, সামর্থ্য এবং ভাষাগত ও জাতিগত পরিচয় নির্বিশেষে শিশুদের উপযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির জন্য একটি পাঠক্রম কাঠামো তৈরি করতে হবে যাতে শেখার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, ফলাফল, ধারাক্রম এবং মূল্যায়ন সম্পর্কে নির্দেশনা থাকবে। প্রস্তাবিত ইসিডি পলিসি ২০০৯-এ সংখ্যালঘু আদিবাসীসহ ০ থেকে ৮ বছর বয়সী সকল শিশুকে উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর ২৩ নং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো-

১. দেশের আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো (পৃষ্ঠা-২)। এই নীতি অনুসারে বিদ্যালয় প্রস্তুতির লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে।

২. প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রসঙ্গে আদিবাসী শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে যা বলা হয়েছে তা হলো- প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব-স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা (পৃষ্ঠা-৪) প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প- দুই (PEDP-II)-এর আওতায় আদিবাসী শিশুর শিক্ষার উন্নয়নে ২০০৬ সালে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, কৌশল ও কর্ম-পরিকল্পনায় আদিবাসী শিশুদের শিক্ষা দানের জন্য স্থানীয় এবং আদিবাসী ভাষা জানেন এমন আদিবাসী শিক্ষক নিয়োগসহ পাঠ্যসূচিতে আদিবাসী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সংযুক্ত করার কথা বলা হয়েছে।

২০১০ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে এমএলই ফোরাম কর্তৃক বাংলাদেশ শিশু একাডেমী মিলনায়তনে আয়োজিত এক মতবিনিময় সেমিনারে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. আফসারুল আমীন বলেন, বর্তমান সরকার আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষায় শিক্ষাসহ অন্যান্য বিষয়ে সচেতন। আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করার মাধ্যমে সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব বলে তিনি উল্লেখ করেন। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী প্রমোদ মানকিন বলেন, আদিবাসী শিশুরা মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারলে তাদের জন্য শিক্ষা গ্রহণ সহজ ও দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং তারা খুব সহজেই মূলধারায় শিক্ষা লাভ করতে পারবে।

বিগত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সিরডাপ মিলনায়তনে এমএলই ফোরাম ও এনসিআইপি কর্তৃক সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে 'মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা বিশ্লেষণ ও আমাদের করণীয় নির্ধারণ' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে অন্তত তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শিশু যাতে তার মাতৃভাষায় পড়াশোনা করতে পারে, সরকার সে ব্যবস্থা নিচ্ছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন বলেন, সরকার ২০১৪ সাল থেকে ছয়টি আদিবাসী ভাষায় প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে একাধিক সভা, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজনপূর্বক জনসংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে এমএলই ফোরাম কর্তৃক ৬টি ভাষা নির্ধারণ করা হয় এবং সুপারিশ আকারে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

এভাবেই ধাপে ধাপে আমাদের দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রতিটি শিশু মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার লাভ করবে বলে সকলের প্রত্যাশা।

এনামুল হক খান তাপস

প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক

সরকার আদিবাসী শিশুদের জন্য প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসাবে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হবে। প্রথম পর্যায়ে চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, ত্রিপুরা, গারো ও ওঁরাও (সাদ্রি) ভাষাভাষী শিশুদের জন্য পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক নির্দেশিকা উন্নয়ন করা হবে। পর্যায়ক্রমে সকল আদিবাসীর জন্য নিজ মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর অঙ্গীকার অনুসারে সকল আদিবাসীর জন্য মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করবে।

আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন সংক্রান্ত সামগ্রিক বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য সরকার ১১ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব আশরাফ ইসলামকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত উদ্যোগের অংশ হিসাবে আদিবাসী শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম উন্নয়নের কাজ চলছে। উপকরণ উন্নয়নের জন্য এনসিটিবি একটি উপকরণ উন্নয়ন কমিটি গঠন করেছে। কমিটির সর্বশেষ সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, আদিবাসী ভাষায় বিদ্যমান উপকরণ পর্যালোচনা করে কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে উপকরণ উন্নয়ন করা হবে। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে ৬টি আদিবাসী ভাষায় শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদান কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

আবু রেজা

এমএলই ম্যাপিং স্টাডি

আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশে বিভিন্ন সংস্থা দীর্ঘদিন থেকে 'মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা' কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিজস্ব উদ্যোগে শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন করে সংস্থাসমূহ এই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

এ সকল উদ্যোগ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে তুলে ধরার পাশাপাশি মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সচেতনতা বিকাশে এডভোকেসি উদ্যোগ গ্রহণের জন্য গণসাক্ষরতা অভিযান ও সহযোগী সংস্থাসমূহ সম্মিলিতভাবে **মাল্টি-লিংগুয়াল এডুকেশন (এমএলই) ফোরাম** গঠন করে।

মাল্টি-লিংগুয়াল এডুকেশন ফোরামের কর্মপরিধি

এই ফোরাম ২০১১ সালে 'বাংলাদেশে মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রম' শীর্ষক একটি ম্যাপিং স্টাডি পরিচালনা করে। ইউনেস্কো-ঢাকার আর্থিক সহায়তায় এমএলই ফোরামের পক্ষে 'গবেষণা ও উন্নয়ন কালেক্টিভ' এই ম্যাপিং স্টাডি পরিচালনা করে। বাংলাদেশে আদিবাসীদের জন্য মাতৃভাষাভিত্তিক কী কী ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, কারা এই কার্যক্রম পরিচালনা করছেন, কী ধরনের শিক্ষাক্রম ও উপকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে ইত্যাদিসহ আনুষঙ্গিক বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত এই ম্যাপিং স্টাডিতে উঠে এসেছে।

এছাড়াও ভবিষ্যতে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে এমএলই কার্যক্রম সম্প্রসারণে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্টজন ও সংগঠনের সুপারিশ স্টাডিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। ২০১১ সালে পরিচালিত এই ম্যাপিং স্টাডিতে প্রাপ্ত তথ্য এবং উপাত্তের ভিত্তিতে 'পহর'-এর আগামী সংখ্যায় একটি লেখা প্রকাশিত হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতিতে জাবারাং কল্যাণ সমিতির অবদান

জাবারাং কল্যাণ সমিতি ১৯৯৫ সালের ২৮ জানুয়ারি মাসে খাগড়াছড়িতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে জাবারাং কল্যাণ সমিতি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় ইস্যুতে গবেষণা ও এডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। জাবারাং ২০০০ সালে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। সংস্থা আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক, প্রাক-প্রাথমিক ও মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা (এমএলই)-সহ শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

'সবার জন্য শিক্ষা' লক্ষ্য অর্জনের জন্য তৃণমূল জনগোষ্ঠী ও সুশীল সমাজকে সংগঠিত করে তাঁদের অভিপ্রায়গুলো নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য জাবারাং বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। এসব কর্মযজ্ঞ সম্পাদনের জন্য জাবারাং স্থানীয় জনগণ ও স্কুলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, নীতি গবেষণা, নীতি এডভোকেসি, এমএলই উপকরণ প্রণয়ন ও প্রকাশ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, স্কুলভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা, শিক্ষা বঞ্চিত এলাকা ও জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে জাবারাং শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

জাবারাং কল্যাণ সমিতির তিনটি কৌশলগত লক্ষ্যের মধ্যে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য হলো- গুণগত মানসম্পন্ন ও একীভূত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের সাক্ষরতা পরিস্থিতির উন্নয়ন। শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে জাবারাং স্কুলভিত্তিক ও কমিউনিটিভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ, গুণগত মানসম্পন্ন ও একীভূত শিক্ষা প্রদান, শিশু ও বয়স্কদের শিক্ষার সুযোগ এবং শিক্ষাঙ্গণে সুশাসন উৎসাহিত ও সুসংহত করতে তৃণমূল জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করে থাকে।

জাবারাং কল্যাণ সমিতি ২০০০ সালে অপেক্ষাকৃত বঞ্চিত গ্রামীণ শিশুদের জন্য ব্র্যাকের সহায়তায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। ২০০৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাবলী চিহ্নিত করার জন্য এ্যাকশন এইড, অক্সফাম-জিবি ও সেভ দ্য চিলড্রেন-ইউকে'র যৌথ উদ্যোগে কমনওয়েলথ এডুকেশন ফাণ্ডের সহায়তায় একটি কর্মগবেষণা পরিচালিত হয়। পিপিআরসি, গণসাক্ষরতা অভিযানসহ অন্যান্য সহযোগী সংস্থা এই কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। একই বছর কেয়ার-এর সঙ্গে যৌথভাবে 'সিএইচটি চিলড্রেন্স অপরচুনিটি ফর লারনিং এনহেন্সমেন্ট' নামের একটি শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। এর মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের বিশেষত প্রত্যন্ত এলাকার মেয়ে শিশু ও আদিবাসী শিশুদের স্কুল গমনের সুবিধা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

২০০৬ সালে সেভ দ্য চিলড্রেন-এর সহায়তায় জাবারাং কল্যাণ সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা সংক্রান্ত নানান প্রতিবন্ধকতার উপর কার্যক্রম শুরু করে। 'শিশুর ক্ষমতায়ন- চিলড্রেন্স একশান ফ্রু এডুকেশন' শিরোনামের

এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম এই প্রকল্পের মূল কাজ। সংশ্লিষ্ট ভাষাগোষ্ঠীর বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখন চাহিদা নির্ণয়, শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন ও প্রকাশ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ভাষা উন্নয়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০০৮ সালে ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ তিন পার্বত্য জেলায় সাপোর্ট টু বেসিক এডুকেশন প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করলে জাবারাং কল্যাণ সমিতি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার পার্টনার হিসেবে এই কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়।

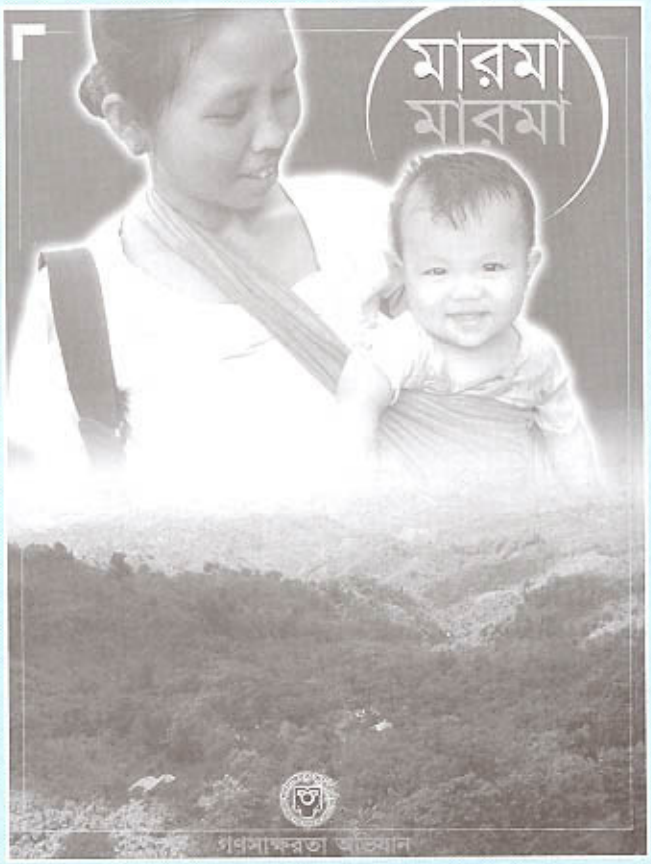

মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি এই প্রকল্পে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ভাষায় এমএলই কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২০১০ সালে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় এই সমিতি মানসম্মত শিক্ষার জন্য 'তৃণমূল উদ্যোগ' নামে নতুন শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে, যার মাধ্যমে দুর্বল স্কুলগুলোর মানোন্নয়ন, এসএমসি-র সক্রিয়করণসহ শিক্ষার মান উন্নয়নে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে জাবারাং কল্যাণ সমিতি শিক্ষা প্রশাসন, সাধারণ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোর সঙ্গে ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, শিক্ষা অফিস, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও বিভাগগুলো জাবারাং কল্যাণ সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে জাবারাং কল্যাণ সমিতি এদেশের অগ্রগামী সংস্থাগুলোর মধ্যে অন্যতম। সংস্থাটি গণসাক্ষরতা অভিযান, জাতীয় আদিবাসী কোয়ালিশন, এমএলই ফোরামসহ বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় নেটওয়ার্কের সক্রিয় সদস্য-সংস্থা।

জাবারাং কল্যাণ সমিতি ইতোমধ্যে ১৩৭৫০ জন শিশুকে মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ১৫ হাজার শিশুকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যারা বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখার সুযোগ পেয়েছে। জাবারাং কল্যাণ সমিতি মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন শ্রেণির পাঠোপকরণ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেছে।

মাথুরা বিকাশ ত্রিপুরা

মারমা উৎসব সাংগ্রাই

মারমা জাতির সবচেয়ে বড় উৎসব হলো সাংগ্রাই উৎসব। বর্ষ বরণ এবং বর্ষ বিদায় উপলক্ষে মারমারা চারদিন ব্যাপী সাংগ্রাই উৎসব উদযাপন করে। বাংলা বছরের শেষ তিন দিন এবং নববর্ষের প্রথম দিন সাংগ্রাই উৎসব উদযাপিত হয়। এই চারদিনের আলাদা আলাদা নাম আছে। নামগুলো হলো : ১. সাংগ্রাই আকিয়ানিহ, ২. সাংগ্রাই আক্রাইনিহ, ৩. সাংগ্রাই আতানিহ, ৪. লাছাইংতারা বা কচুংলাহচাইংতারা।

সাংগ্রাই আকিয়ানিহ উদযাপিত হয় ২৯ চৈত্র। এদিন মারমা জাতির লোকসকল আনুষ্ঠানিকভাবে নদীর ঘাটে ভগবান বুদ্ধের মূর্তি নিয়ে আসে। নদীতে রাখা ভেলাতে মূর্তিটি বসিয়ে চন্দন পানি ও দুধ দিয়ে গোসল করিয়ে মূর্তিটিকে আবার যথাস্থানে রেখে আসে।

সাংগ্রাই আক্রাইনিহ এবং সাংগ্রাই আতানিহ উদযাপিত হয় ৩০ এবং ৩১ চৈত্র। এ দুদিন মারমা জাতির লোকসকল খুব আনন্দ ও উল্লাসের মধ্যে কাটায়। এ সময় পাড়ায় পাড়ায় চলে পানি খেলা। পুরানো বছরের দুঃখ, গ্লানি, ব্যর্থতা দূর করে আগামী বছর সুখ শান্তিতে পূর্ণ হওয়ার ইচ্ছায় একজন অন্যজনকে পানি ছিটায়। বান্দরবান শহরে মঞ্চ তৈরি করে নৌকা ভর্তি রঙিন পানি নিয়ে মারমা ছেলে মেয়েরা পানি খেলায় মেতে ওঠে।

দূরবর্তী সাধারণ মারমা জাতির লোকসকলের মধ্যে অবশ্য এর তেমন প্রচলন নেই। বার্মার বোমাং রাজপরিবার প্রথম এই উৎসবের আয়োজন করে। এমনকী এ উপলক্ষে 'সাংগ্রাইআকা' নামে যে নৃত্যগীত হয় তারও শুরু বোমাং রাজপরিবার থেকে। এসব নৃত্যগীতে বার্মিজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ছাপ আছে। মারমা জাতির লোকসকল এসময় মন্দিরে প্রার্থনা করে। প্রবীণদের যত্ন করে গোসল করিয়ে পুণ্য আদায় করে। মারমারা নববর্ষের দিন বা লাছাইংতারা বা কচুংলাহচাইংতারা অনুষ্ঠান পালন করে। এদিন পানি খেলা হয় না। বছরের প্রথম দিন অনুষ্ঠান শুরু করার আগে মারমা নারীরা বৌদ্ধ মন্দির ধোয়া মোছা করে। সে সঙ্গে নিজের বাড়িঘর এমনকি পোশাক-পরিচ্ছেদও ধুয়ে পরিষ্কার করে।

এ কারণে সবখানে সাজ সাজ রব পড়ে। মারমা জাতি সাংগ্রাই উৎসবে যে নৃত্যগীত করে এর একটি হলো সাংগ্রাইটে। এসময় যে গান করে তা হলো :

'শুভ নতুন বছরে আমরা সবাই মিলে জল উৎসব করি,
এসো ভাই, এসো দিদিরা আমরা সবাই আজ একত্র হই।
নববর্ষের এই শুভ দিনটি বছরে একবার আসে
আমাদের বৌদ্ধধর্মের এটি একটি পবিত্র দিন।
আজ তাই সবাই বিহারে যাবো, পঞ্চশীল নেবো।
গুরুজনদের প্রণাম, শ্রদ্ধা জানাব।
আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ন রাখব।'

কুমার প্রীতীশ বল

হাজং রূপকথা

হাজং ভাষা
জুনজুনিলী জুই

ঈশ্বরলা পৃথিবী কতনা সুন্দর। কারো বেদেন কুন চিকঠামী নাই। খালী উগে হুতু ও কালা ছেমকে বানাছে। উদিই জুনজুনিলী মননি সুখ নাই। উলা পাশ দিয়ী চরেকানা উইড়িয়ী যায়। উগে দিখিয়ী কয়, 'তুলা মনরা ভার কেনে?

জুনজুনি কয়- 'ধন্যবাদ, ইদী মুলা কপাল লা দুষ।'

পাশ দিয়ী আবার ভমর।
জুনজুনিওেগ দেইখী কয়-'কি হুছে তুলা?

ভমরগে ধন্যবাদ দিয়ী
জুনজনি কুলে-
'কুনু নি হয় মুলা।'

তানি মী পোকা বইহী
থাকিবাগে দিইখী কুলে-
'কি করে তয় ইখলাই?

জুনজুনি লাম্বা দম নিয়ী
কুলে-'ঠাকুর কেনে মরবায়
না চালে? আর কেনে হুতু
ও কালা ছেম ছেম কে
বানালে?'

জুনজুনি কথা হুনী মী পোকা কুলে-'তয় দুখ নাপা। ঠাকুরলী হয়ত কুন মহৎ কাম রুছে। ঠাকুরলী সৃষ্টি বিবাক ভালা।'

একদিনী হুনিছে-ভগবানলা ভান্ডার থকন অপাসা আলো চর যাছে। ভগবান হুবাগে ডাকালে। হুবাই আহিলে জুনজুনি ভগবানলা ডাকননি নাহিলে। হুবাই আহিলে কিন্তু জুনজুনি ভগবানলা ডাকননি নাহিলে। হুবাই জানিলে-জুনজুনি ভগবানলা ভান্ডার থকন আলো চর কুছে। উ থকন জুনজুনিগে আর দিননি না দেখে। যি আলো অয় চর কুছে উই আলোরা দিননি আর কাম না লাগিলে। দিনলী জগৎনি অয় নিষিদ্ধ হুয়ে যালে। অয় ইলা অন্ধকার জগৎনি পথ হারিয়ী কালা জগৎনি জুই জুলী ভগবানকে খুজি।

বাংলা ভাষা
জোনাকির আলো

ঈশ্বরের পৃথিবী কতই না সুন্দর, কারো জন্য কোনো কৃপণতা নেই। আর সে কারণেই জোনাকির মনে কোনো সুখ নেই। তার পাশ দিয়ে প্রজাপতি উড়ে যায়। আর তাকে দেখে বলে, তোমার মনটা এত ভার কেন?

জোনাকি বলে, ধন্যবাদ, এটা আমার কপালের দোষ।

পাশ দিয়ে আবার ভ্রমর উড়ে যায়।
জোনাকিকে দেখে বলে, কী হয়েছে তোমার?

ভ্রমরকে ধন্যবাদ দিয়ে
জোনাকি বলে,
না কিছু হয়নি আমার।

তাকে বসে থাকতে দেখে
মৌমাছি বলে,
তুমি একা বসে কী করছ?

জোনাকি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, ঠাকুর কেন আমার দিকে মুখ ফিরাল না? কেন ছোট্ট এবং কালো কুচকুচে করে আমায় বানাল?

জোনাকির কথা শুনে মৌমাছি বলল, তুমি এতে দুঃখ পেয়ো না। ঠাকুরের হয়ত মহৎ কোনো চিন্তা আছে। ঠাকুরের সৃষ্টি সবই ভালো।

একদিন শোনা গেল ভগবানের ভাণ্ডার থেকে অল্প একটু আলো চুরি গেছে। ভগবান সবাইকে ডাকলেন। সবাই এলো। কিন্তু ভগবানের ডাকে জোনাকি এলো না। সবাই জেনে গেল জোনাকি ভগবানের ভাণ্ডার থেকে আলো চুরি করেছে। সে দিন থেকে জোনাকিকে আর দিনের বেলায় দেখা গেল না। যে আলো চুরি করল, সে আলো আর কোনো দিন কাজে লাগল না। দিনের জগতে সে নিষিদ্ধ হয়ে গেল। তখন থেকে সে অন্ধকার জগতে পথ হারিয়ে কালোর জগতে আলো জ্বেলে ভগবানকে খুঁজছে।

সংগ্রহ : স্বপন হাজং

অনুবাদ : হাজং হরিদাস রায়

লোককাহিনী, রূপকথা, ছড়া, ধাঁধা সব মিলিয়ে আদিবাসীদের লোকসাহিত্য ভাণ্ডার খুব সমৃদ্ধ। এখানে হাজং আদিবাসীদের একটি রূপকথা প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য এর অনুবাদ একই সঙ্গে দেওয়া হলো। আগামীতে অন্য আদিবাসীদের লোকসাহিত্য প্রকাশ করা হবে।

বিশ্বব্যাপী সুবিধাবঞ্চিতদের শিক্ষার অধিকার নিয়ে কাজ করে গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশন আদিবাসীসহ সকল সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা নিশ্চিত করার দাবিতে প্রণীত প্রতিবেদনের

সারসংক্ষেপ

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দেখা গেছে, প্রায় ২২১ মিলিয়ন শিশু শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক কর্তৃক পড়ানোর ভাষা সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। পৃথিবীর অনেক দেশই তাদের জাতীয় ভাষা বা আন্তর্জাতিক কোনো ভাষায় শিক্ষা প্রদান করে থাকে যা অনেক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুরা তাদের বাড়িতে ব্যবহার করে না। যার ফলে শ্রেণিকক্ষে অপরিচিত ভাষায় কী বলা হচ্ছে তার অর্থ বা সংকেত শিশুরা বুঝতে পারে না। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় বেশির ভাগ শিশু বাড়িতে একভাষায় কথা বলে যা তাদের বিদ্যালয়ের ভাষার সঙ্গে এক হয় না। এতে করে তারা বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশে এমনিতেই শিক্ষার মান সন্তোষজনক নয়। তার উপর আবার বিদ্যালয়ের ভাষা অনেক শিক্ষার্থীর কাছে বোধগম্য না হওয়ায় ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধিতে তা একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। সারা বিশ্বে ঝরে পড়া শিশুদের প্রায় ৫০ ভাগই বাড়িতে এক ভাষা আর বিদ্যালয়ে অন্য ভাষায় লেখাপড়ার কারণে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে।

একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, শিশুরা মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করলে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করে ও লেখাপড়ার মানও থাকে সন্তোষজনক। খুব অল্প সংখ্যক দেশ এরই মধ্যে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষা ব্যবহার করে অনেক ভালো ফলাফল অর্জন করেছে। এসব গবেষণার বিষয়বস্তু জাতীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে উত্থাপন করা দরকার, যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলো বিদ্যমান অবস্থার, বিশেষ করে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করতে পারে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে একটি সুসঙ্গত ভাষা নীতি তৈরি করতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ধারণ করা প্রয়োজন। প্রথমত, প্রাথমিকভাবে মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে বিশেষ করে শিখন নির্দেশনা প্রদান করতে অবশ্যই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশ দিতে হবে। দ্বিতীয় ভাষাকে খুব যত্ন সহকারে পরিচিত করার কাজটিও করতে হবে। গবেষণায় এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, যদি প্রথম ভাষা কেউ ভালোভাবে রপ্ত করতে পারে, তাহলে দ্বিতীয় ভাষাতেও সে ভালো করতে পারে।

শিশুদের উপযোগী করে নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিয়ে বিষয়বস্তুর মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষার কারিকুলাম ও পর্যাপ্ত লিখিত উপকরণ তৈরি করতে হবে। পর্যাপ্ত উপকরণের অভাবে শিশুদের শিখন প্রক্রিয়ায় অতিশয় নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। একই সঙ্গে শিক্ষকদেরও মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষকদের কেন্দ্রীভূত নিয়োগ পদ্ধতির সংস্কার করে স্থানীয় ভাষায় কথা বলতে পারদর্শী শিক্ষক নিয়োগের বিধান চালু করতে হবে। এজন্য শিক্ষক নিয়োগ, তাদের প্রশিক্ষণের বিকেন্দ্রীকরণ খুবই জরুরি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, মাতৃভাষায় শিক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে অনেক বিনিয়োগ করার প্রয়োজন আছে কী। কিন্তু মনে রাখতে হবে শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া এবং তাদের পুনরায় শিক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্য অনেক অপচয় হয় এবং তার পুনঃবিনিয়োগ প্রয়োজন হয়। মাতৃভাষায় শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যে বিনিয়োগ প্রয়োজন তা পূর্বোক্ত বিনিয়োগের চেয়ে অনেক কম।

পরীক্ষামূলকভাবে গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক এমএলই নিউজলেটার প্রকাশিত হলো। এই পত্রিকাটির মানোন্নয়নের জন্য মতামত প্রদান করতে সকলের প্রতি আহবান জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে যে কোনো ধরনের মতামত গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

European Union

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৮১১৫৭৬৯, ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১-২, ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org